# প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে - ১

অভিজিৎ রায়

'তবুও মরিতে হবে, এও সত্য জানি
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে,
মোর কানে কানে
রজনী কবে না তার রহস্যবারতা
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি,
মোর শেষ কথা।'

--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## আছে জন্ম, আছে মৃত্যু, আছে প্রাণ :

প্রাণ বা জীবন কি (What is life?)- এ প্রশ্নটি মানব মনের সব চাইতে পুরাতন অথচ কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্নগুলোর একটি। এ প্রশ্নটির ব্যঞ্জনায় যুগে যুগে আলোড়িত হয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সাহিত্যিক, কবি, গীতিকার, দার্শনিক, বৈরাগী সকলেই। গীতিকারেরা গান রচনা করেছেন - 'জীবন - সে তো পদ্মপাতায় শিশির বিন্দু'। কবি তার

কল্পণার মায়াজাল বুনে লিখেছেন- 'life is nothing but an empty dream'। বৈরাগী হয়ত মারফতি করে বলেছেন - 'জীবনটা তো মায়া ছাড়া আর কিছু নয়'। আসলে জীবনটা যে সত্যিই কি - এ প্রশ্নের উত্তর দার্শনিক-অদার্শনিক, পন্ডিত-মূর্খ কারো কাছেই খুব সঠিকভাবে বোধ হয় পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীবন বা প্রাণ কি এটা জানতে হলে 'জীবন কি নয়' এটা বোধ হয় আগে ভালভাবে জানা দরকার। জীবজগৎ আর জড়জগৎ - এ নিয়েই আমাদের চিরচেনা বিশ্বজগৎ। প্রাণের নিশ্চয়ই এমন কোন নান্দনিক বিশিষ্টতা আছে যা জড় পদার্থ থেকে আলাদা। আর সে কারণেই অ্যামিবা, পুঁটিমাছ, কচু শাক, হাতি, তিমি, ইঁদুর বা মানুষদের সহজেই ইট, কাঠ, লোহা, পাথর থেকে আলাদা করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি সেই নান্দনিক বিশিষ্টতা?

প্রাচীনকালের মানুষেরা যে এ সমস্যা নিয়ে ভাবেনি তা নয়। জীবিতদের কি ভাবে সনাক্ত করা যায়? একটি মৃতদেহ আর একটি জীবিত দেহের মধ্যে পার্থক্যই বা কি? এ প্রশ্নগুলো দিয়ে তাদের অনুসন্ধিৎসু মন সবসময়ই আন্দোলিত হয়েছে পুরোমাত্রায়। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে তারা শেষপর্যন্ত কল্পনা করে নিয়েছে অদৃশ্য আত্মার। ভেবেছে আত্মাই বুঝি জীবন ও মৃত্যুর যোগসূত্র। কল্পনার ফানুস উড়িয়ে তারা ভেবেছে ঈশ্বরের নির্দেশে আজরাইল বা যমদূত এসে প্রাণহরণ করলেই কেবল একটি মানুষ মারা যায়। আর তখন তার দেহস্থিত আত্মা পাড়ি জমায় পরলোকে। মৃত্যু নিয়ে মানুষের এ ধরনের ভাববাদী চিন্তা জন্ম দিয়েছে আধ্যাত্মবাদের। আধ্যাত্মবাদ স্বতঃপ্রমাণ হিসেবেই ধরে নেয়-'আত্মা জন্মহীন, নিত্য, অক্ষয়। শরীর হত হলেও আত্মা হত হয় না।' মজার ব্যাপার হল, একদিকে যেমন আত্মাকে অমর অক্ষয় বলা হচ্ছে, জোর গলায় প্রচার করা হচ্ছে আত্মাকে কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, আবার সেই আত্মাকেই পাপের শাস্তিস্বরূপ নরকে ধারলো অস্ত্র দিয়ে কাটা, গরম তেলে পোড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সবই আধ্যাত্মবাদের স্ববিরোধিতা। ধর্মগ্রন্থগুলি ঘাটলেই এ ধরনের স্ববিরোধিতার হাজারো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। স্ববিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও আত্মার অস্তিত্ব দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছে মানুষ। কারণ সে সময় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ছিল সীমিত। মৃত্যুর সঠিক কারণ ছিল তাদের জানার বাইরে। সেজন্য অনেক ধর্মবাদীরাই 'আত্মা' কিংবা 'মন' কে জীবনের আধাররূপী বস্তু হিসেবে কল্পনা করেছেন। যেমন, ইসলামিক মিথ্ বলছে, আল্লাহ মানবজাতির সকল আত্মা একটি নির্দিষ্ট দিনে তৈরী করে বেহেস্তে একটি নির্দিষ্ট স্থানে (ইল্লিন) বন্দি করে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছাতেই নতুন নতুন প্রাণ সঞ্চারের জন্য একেকটি আত্মাকে তুলে নিয়ে মর্তে পাঠানো হয়। আবার আচার্য শঙ্কর তার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলেছেন, 'মন হল আত্মার উপাধি স্বরূপ'। ওদিকে আবার সাংখ্যদর্শনের মতে - 'আত্মা চৈতন্যস্বরূপ' (সাংখ্যসুত্র ৫/৬৯)। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে, 'চৈতন্যই জীবের লক্ষণ বা আত্মার ধর্ম।' (ষড়দর্শন সমুচ্চয়, পৃঃ ৫০) স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত ভাবতেন, 'চৈতন্য বা চেতনাই আত্মা।'

(বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পৃঃ ১৬২) স্বামী অভেদানন্দের মতে, 'আত্মা বা মন মস্তিস্ক বহির্ভুত পদার্থ, মস্তিষ্কজাত নয়।' (মরণের পারে, পৃঃ ৯৮)। গ্রীক দর্শনেও আমরা প্রায় একই রকম ভাববাদী দর্শনের ছায়া দেখতে পাই। প্লেটোর বক্তব্য ছিল যে, প্রাণী বা উদ্ভিদ কেউ জীবিত নয়, কেবলমাত্র যখন আত্মা প্রাণী বা উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে তখনই তাতে জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। সব ধর্মমতই প্রচলিত এই ধারণার সাথে সঙ্গতি বিধান করে। প্লেটোর এই তত্ত্ব অ্যারিস্টটলের দর্শনের রূপ নিয়ে প্রায় দু-হাজার বছর রাজত্ব করে। অ্যারিস্টটলের পরবর্তী গ্রীক ও রোমান দার্শনিকেরা অ্যারিস্টটলীয় দর্শনকে প্রসারিত করে পরবর্তী যুগের চাহিদার উপযোগী করে তোলেন। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকে নয়া প্লেটোবাদীরা 'ঈশ্বর অজৈব বস্তুর মধ্যে জীবন সৃষ্টিকারী আত্মা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাকে জীবন দান করেন' - এই মত প্রচার করতে শুরু করেন। নয়া প্লেটোবাদী প্লাটিনাসের মতে, 'জীবনদায়ী শক্তিই জীবনের মূল।' বস্তুতপক্ষে, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'জীবনশক্তি' (life force) তত্ত্ব এখান থেকেই যাত্রা শুরু করে এবং জীবনের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিও জোরালো হয়। ধর্মবাদী চিন্তা, বৈজ্ঞানিক অনগ্রসরতা, কুসংস্কার, ভয় সব কিছু মিলে শিক্ষিত সমাজে এই ভাববাদী চিন্তাধারার দ্রুত প্রসার ঘটে।

**চিত্র ১.১ :**ক) নিয়ান্ডার্থালদের মৃতদেহ কবর দেওয়ার সময় পারলৌকিক আচার আচরণ
খ) শানিদার গুহায় পাওয়া ফসিলের অবশেষ।

আসলে আত্মার অস্তিত্বের ব্যাপারটি মানুষের মৃত্যুভয়ের সাথে অঙ্গাংগি ভাবে জড়িত তাই তা জনমানসে রাজত্ব করেছে দীর্ঘকাল। এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, আত্মা দিয়ে জীবন মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার করার প্রচেষ্টা প্রথম শুরু হয়েছিলো নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আমলে - যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। নিয়ানডার্থাল মানুষের আগে পিথেকানথ্রোপাস আর সিনানথ্রোপাসদের মধ্যে এ ধরনের ধর্মাচরণের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিশ্বাসগুলো ছিল

একেবারেই আদিম- আজকের দিনের প্রচলিত ধর্মমতগুলোর তুলনায় অনেক সরল। ইরাকের শানিদার নামের একটি গুহায় নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বেশ কিছু ফসিল পাওয়া গেছে যা দেখে অনুমান করা যায় যে, নিয়ান্ডার্থালরা প্রিয়জন মারা গেলে তার আত্মার উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন করতো। এমনকি তারা মৃতদেহ কবর দেয়ার সময় এর সাথে পুষ্পরেণু, খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্র সামগ্রী, শিয়ালের দাঁত এমনকি মাদুলীসহ সব কিছুই দিয়ে দিত যাতে পরপারে তাদের আত্মা শান্তিতে থাকতে পারে আর সঙ্গে আনা জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারে।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আর যুক্তির প্রসারের ফলে আজ কিন্তু আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো মানুষের চোখে সহজেই ধরা পড়ছে। যদি জীবনকে 'আত্মার উপস্থিতি' আর মৃত্যুকে 'আত্মার দেহত্যাগ' দিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়, তবে তো যে কোন জীবিত সত্ত্বারই - তা সে উদ্ভিদই হোক আর প্রাণীই হোক- আত্মা থাকা উচিৎ। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে একটি দেহে কি কেবল একটিমাত্র আত্মা থাকবে নাকি একাধিক? যেমন, বেশ কিছু উদ্ভিদ - গোলাপ, কলা, ঘাসফুল এমন কি হাইড্রা, কোরালের মত প্রাণীরাও কর্তন (Cut) ও অঙ্কুরোদ্গমের (Bud) মাধ্যমে বিস্তৃত হয়। তাহলে কি সাথে সাথে আত্মাও কর্তিত হয়, নাকি একাধিক আত্মা সাথে সাথেই অঙ্কুরিত হয়? আবার মাঝে মধ্যেই দেখা যায় যে, পানিতে ডুবে যাওয়া, শ্বাসরুদ্ধ, মৃত বলে মনে হওয়া/ঘোষিত হওয়া অচেতন ব্যক্তির জ্ঞান চিকিৎসার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয় - তখন কি দেহত্যাগী বৈরাগী আত্মাকেও সেই সাথে ডেকে ঘরে থুড়ি দেহে ফিরিয়ে আনা হয়? প্রজননকালে পিতৃদত্ত শুক্রানু আর মাতৃদত্ত ডিম্বানুর মিলনে শিশুর দেহকোষ তৈরী হয়। শুক্রানু আর ডিম্বানু জীবনের মূল, তাহলে নিশ্চয় তাদের আত্মাও আছে। এদের আত্মা কি তাদের আভিভাবকদের আত্মা থেকে আলাদা? যদি তাই হয় তবে কিভাবে দুটি পৃথক আত্মা পরস্পর মিলিত হয়ে শিশুর দেহে একটি সম্পূর্ণ নতুন আত্মার জন্ম দিতে পারে? মানব মনের এ ধরনের অসংখ্য যৌক্তিক প্রশ্ন আত্মার অসারত্বকেই ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছে।

আর ভাববাদীরা যাই বলুক না কেন স্কুলের পাঠ শেষ করা ছাত্রটিও আজ জানে, মন কোন 'বস্তু' নয়; বরং মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষের কাজ কর্মের ফল। চোখের কাজ যেমন দেখা, কানের কাজ যেমন শ্রবণ করা, পাকস্থলীর কাজ যেমন খাদ্য হজম করা, তেমনি মস্তিস্ক কোষের কাজ হল চিন্তা করা। তাই নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক তাঁর 'The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul' গ্রন্থে পরিস্কার করেই বলেন: 'বিস্ময়কর অনুকল্পটি হল: আমার 'আমিত্ব', আমার উচ্ছ্বাস, বেদনা, স্মৃতি, আকাংখা, আমার সংবেদনশীলতা, আমার পরিচয় এবং আমার মুক্তবুদ্ধি এগুলো আসলে মস্তিস্কের স্নায়ুকোষ এবং তাদের আনুষঙ্গিক অণুগুলোর বিবিধ ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।' মানুষ চিন্তা করতে পারে বলেই নিজের ব্যক্তিত্বকে নিজের মত করে সাজাতে পারে, সত্য-মিথ্যের মিশেল দিয়ে কল্পণা করতে পারে তার ভিতরে 'মন' বলে সত্যই কোন পদার্থ

আছে, অথবা আছে অদৃশ্য কোন আত্মার আশরীরী উপস্থিতি। মৃত্যুর পর দেহ বিলীন হয়। বিলীন হয় দেহাংশ, মস্তিস্ক স্নায়ুকোষ। আসলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের মৃত্যু মানেই কিন্তু 'মন' এর মৃত্যু, সেই সাথে মৃত্যু তথাকথিত আত্মার। অনেক সময় দেখা যায় দেহের অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ ঠিকমত কর্মক্ষম আছে, কিন্তু মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হারিয়ে গেছে। এ ধরনের অবস্থাকে বলে কোমা। মানুষের চেতনা তখন লুপ্ত হয়। মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে জীবিত দেহ তখন অনেকটা জড়পদার্থের মতই আচরণ করে। তাহলে জীবন ও মৃত্যুর যোগসূত্রটি রক্ষা করছে কে? এ কি অশরীরী আত্মা, নাকি মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষের সঠিক কর্মক্ষমতা?

এ পর্যায়ে বিখ্যাত ক্রিকেটার রমণ লাম্বার মৃত্যুর ঘটনাটি স্মরণ করা যাক। ১৯৯৮ সালের ২০ এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা স্টেডিয়ামে (বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম) লীগের খেলা চলাকালীন সময় মেহেরাব হোসেন অপির একটি পুল শট ফরওয়ার্ড শর্ট লেগে ফিল্ডিংরত লাম্বার মাথায় সজোরে আঘাত করে। প্রথমে মনে হয়েছিল তেমন কিছুই হয় নি। নিজেই হেঁটে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন; কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরই জ্ঞান হারালেন তিনি। চিকিৎসকেরা তাকে ক্লিনিকে ভর্তি করলেন। পরদিন ২১ এ ফেব্রুয়ারী তাকে পিজি হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগে ভর্তি করা হল। সেখানে তার অপারেশন হল, কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। পরদিন ২২ এ ফেব্রুয়ারী ডাক্তাররা ঘোষণা করলেন যে, মস্তিষ্ক তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। হার্ট-লাং মেশিনের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে হৃৎপিন্ড এবং ফুসফুসের কাজ চলছিল।

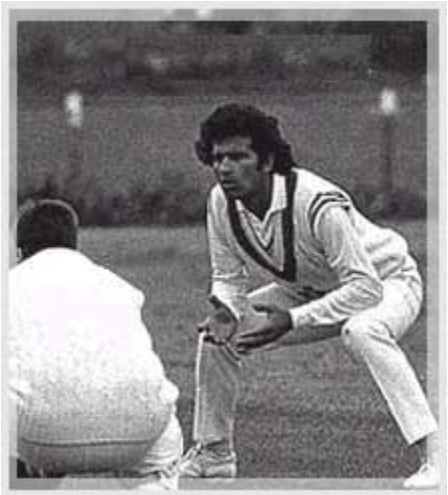

**চিত্র ১.২ :** রমন লাম্বা : মেধাবী ক্রিকেটারের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু

২৩ ফেব্রুয়ারী বিকেল সাড়ে তিনটায় তার আইরিশ স্ত্রী কিমের উপস্থিতিতে হার্ট লাং মেশিন বন্ধ করে দিলেন চিকৎসকেরা। থেমে গেল লাম্বার হৃৎস্পন্দন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডেথ

সার্টিফিকেটে মৃত্যুর তারিখ কোনটি হওয়া উচিৎ? ২২ নাকি ২৩ ফেব্রুয়ারী? আর তার মৃত্যুক্ষণটি নির্ধারণ করলেন কারা? আজরাইল/যমদূত নাকি চিকিৎসারত ডাক্তারেরা?

এ ব্যাপারটি আরও ভালভাবে বুঝতে হলে মৃত্যু নিয়ে দু'চার কথা বলতেই হবে। জীবনের অনিবর্তনীয় পরিসমাপ্তিকে (Irreversible cessation of life) বলে মৃত্যু। কেন জীবের মৃত্যু হয়? কারণ আমরা (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) উত্তরাধিকার সূত্রে বিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যারা যৌনসংযোগের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে প্রকৃতিতে টিকে রয়েছে তাদের থেকে মরণ জিন (Death Gene) প্রাপ্ত হয়েছি এবং বহন করে চলেছি। এই ধরনের জিন (Death Gene) তার পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পিত উপায়েই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে চলেছে। যৌনজননের মাধ্যমে বংশবিস্তাররের ব্যাপারটিতে আমি এখানে গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ, যে সমস্ত প্রজাতি যৌনজননকে বংশবিস্তারের একটি মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে, তাদের 'মৃত্যু' নামক ব্যাপারটিকেও তার জীবগত বৈশিষ্ট হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হয়েছে। দেখা গেছে স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রে সেক্স-সেল বা যৌনকোষগুলোই (জীববিজ্ঞানীরা বলেন 'জার্মপ্লাজম') হচ্ছে একমাত্র কোষ যারা সরাসরি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে নিজেদের জিন সঞ্চারিত করে টিকে থাকে। সে তুলনায় দেহকোষগুলো হয় স্বল্পায়ুর। অনেকে এই ব্যাপারটির নামকরণ করেছেন 'প্রোগ্রামড্ ডেথ'। এক প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী হালকাচালে তার একটি লেখায় বলেছেন, 'মৃত্যু'ও বোধহয় সিফিলিস বা গনোরিয়ার মত একধরনের 'Sexually Transmitted Disease' যা আমরা বংশ পরম্পরায় সৃষ্টির শুরু থেকে বহন করে চলেছি! ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার মত সরল কোষী জীব যারা যৌন জনন নয়, বরং কোষ বিভাজনের মাধ্যমে প্রকৃতিতে টিকে আছে তারা কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই অমর। এদের দেহ কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিভাজিত হয়, তার পর বিভাজিত অংশগুলিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় বিভাজিত হয়; কোন অংশই আসলে সেভাবে 'মৃত্যুবরণ' করে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে 'মৃত্যু' ব্যাপারটি সব জীবের জন্যই অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক নয়। তবে মানুষের নিজের প্রয়োজনে রাসায়নিক জীবাণুনাশক ঔষধপত্রাদির উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগে জীবাণুনাশের ব্যাপারটি এক্ষেত্রে আলাদা।

আসলে মানুষের মত বহুকোষী উচ্চশ্রেনীর প্রাণীদের মৃত্যু দু' ধরনের। দেহের মৃত্যু (Clincal Death) এবং কোষীয় মৃত্যু (Cellular Death)। দেহের মৃত্যুর স্বল্প সময় পরেই কোষের মৃত্যু ঘটে। মানব দেহের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ রয়েছে - মস্তিস্ক, হৃৎপিন্ড, আর ফুসফুস। যে কোন একটির বা সবগুলোর কার্যকারিতা নষ্ট হলে মৃত্যু হতে পারে। যেমন, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বন্ধ হলে কোমা হয়, রমণ লাম্বার ক্ষেত্রে যেটি ঘটেছে; হৃৎপিন্ডের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াকে বলে সিনকোপ, আর ফুসফুসের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াকে বলে আসফিক্সিয়া। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও কিন্তু 'মৃত্যু' ব্যাপারটার সংজ্ঞা দেওয়া এতোটা কঠিন ছিলো না। খুব সহজ সংজ্ঞা। হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার সাথে সাথেই কিংবা ফুসফুস তার হাপরের উঠানামা

বন্ধ করে দেওয়ার সাথে সাথেই ব্যক্তির জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু ১৯৬৮ সালে হৃৎসংস্থাপন (Heart Transplant) প্রক্রিয়ার আবিস্কার এবং এ সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নয়নের পর মৃত্যুর এই সংজ্ঞা কিন্তু বদলে যায়। কিভাবে এখন হলফ করে সেই 'হৃদয়দাতা'কে মৃত বলা যাবে যখন চোখের সামনেই তার হৃদয় অন্যের দেহে স্পন্দিত হয়ে চলেছে? চিকিৎসা বিজ্ঞান পুরো ব্যাপারটিকে আরো জটিল করে ফেললো শ্বাসযন্ত্র বা রেস্পিরেটর আবিষ্কার করে- যেটি হৃৎপিন্ড আর ফুসফুসকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আধুনিক কোন কবি কিন্তু এখন মৃত্যু নিয়ে কবিতা লিখতেই পারেন এই বলে যে - 'হে হিমশীতল মৃত্যু - তুমি হচ্ছ রেস্পিরেটর সুইচের সহসা নির্বাপন!'

যত দিন যাচ্ছে ততই কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে জীবন আয়ু ত্বরান্বিত করার ব্যাপারটি খুব সাধারণ একটি বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেক মৃত্যুপথ যাত্রী অসুস্থ রোগীর মৃত্যু নানাভাবে বিলম্বিত করা গেছে - কারো কারো জন্য কম সময়ের জন্য, আবার কারো জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য। যেমন ধরুন বার্নি ক্লার্ক নামের এক ডেনটিস্ট ভদ্রলোকের উদাহরণ, যিনি ১৯৮২ সালে নিজের রোগাক্রান্ত হৃৎপিন্ডের পরিবর্তে একটি যান্ত্রিক হৃদয় নিয়ে বেঁচে ছিলেন কয়েক মাস যাবৎ। আবার ১৯৮৪ সালে সদ্যজন্মলাভ করা শিশু ফে কে অতিরিক্ত ২০দিন বাঁচিয়ে রাখা গিয়েছিলো একটি বেবুনের হৃৎপিন্ড সংযোজন করে।

**চিত্র ১.৩ :** ডিসেম্বর ২, ১৯৮২ : বার্নি ক্লার্কের দেহে ইতিহাসে প্রথমবারের মত যান্ত্রিক হৃৎপিন্ড সংস্থাপন।

আশির দশকের প্রথম দিকে জেমি ফিস্কের 'জীবন প্রাপ্তি'র উদাহরণটি আরেকটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে উঠে আসতে পারে পাঠকদের কাছে। এগারো মাসের শিশু জেমি আর হয়ত বড়জোর একটা ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারত-তার জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ যকৃৎ নিয়ে। তার বাঁচবার একটিমাত্র ক্ষীণ সম্ভাবনা নির্ভর করছিল যদি কোন সুস্থ শিশুর যকৃৎ কোথাও পাওয়া

যায় আর ওটি ঠিকমত জেমির দেহে সংস্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু এতো ছোট বাচ্চার জন্য কোথাওই কোন যকৃত পাওয়া যাচ্ছিলো না। যে সময়টাতে জেমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ছিলো আর মৃত্যুর থাবা হলুদ থেকে হলুদাভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিলো সারা দেহে, ঠিক সে সময়টাতেই হাজার মাইল দূরে একটি ছোট্ট শহরে এক বিচ্ছিরি ধরণের সরক দূর্ঘটনায় পড়া দশ মাসের শিশু জেসি বেল্লোনকে হুড়াহুড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। যদিও মাথায় তীব্র আঘাতের ফলে জেসির মস্তিষ্ক আর কাজ করছিলো না, কিন্তু দেহের অন্যান্য অংগপ্রত্যংগগুলোকে কিন্তু রেস্পিরেটরের সাহায্যে ঠিকই কর্মক্ষম করে রাখা হয়েছিলো। জেসির বাবা রেডিওতে দিন কয়েক আগেই একটি যকৃতের জন্য জেমির অভিভাবকদের আর্তির কথা শুনেছিলেন। শোকগ্রস্ত পিতা এতো দুঃখের মাঝেও মানবিক কর্তব্যবোধকে অস্বীকার করেননি। তিনি ভেজিটেশনে চলে যাওয়া নিজের মেয়ের অক্ষত যকৃৎটি জেমিকে দান করে তাকে বাঁচনোর চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। জেসির রেস্পিরেটর বন্ধ করে দিয়ে তার যকৃৎ সংরক্ষিত করে মিনেসোটায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। জেমির বহু প্রতীক্ষিত অস্ত্রপ্রচার সফল হলো। এভাবেই জেসির আকস্মিক মৃত্যু সেদিন জেমি ফিস্ককে দান করল যেন এক নতুন জীবন। সেই ধার করা যকৃৎ নিয়ে পুনর্জ্জীবিত জেমি আজো বেঁচে আছে- পড়াশুনা করছে, দিব্যি হেসে খেলে বেড়িয়ে পার করে দিয়েছে জীবনের চব্বিশটি বছর!

এবার আসুন প্রিয় পাঠক - আপনাদের জিমি টন্টলিউজের ঘটনাটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। এক শুভ্র সকালে তরুণ জিমি লেক মিশিগানের উপর দিয়ে স্কেট করতে গিয়ে একস্তর পুরু বরফের আস্তরণ ভেদ করে হিমশীতল জলে তলিয়ে যায়। ও অবস্থাতেই ছিল সে অনেকক্ষণ। প্রায় আধাঘন্টা পরে পথচারীরা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। দেখে মনে হচ্ছিল জিমি মারাই গিয়েছে বুঝি, তার হৃৎস্পন্দন, নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে গিয়ে সেবাশুশ্রুষার শুরু করার প্রায় একঘন্টা পরে ছেলেটির দেহে যেন জীবনের বৈশিষ্ট্য আবারো 'নতুন করে' ফিরে আসতে শুরু করলো। আসলে ঠান্ডা পানির তীব্র ঝাপ্টা জিমির দেহকে একেবারে অসাড় করে দিয়েছিলো। যদিও সাময়িক সময়ের জন্য হৃৎস্পন্দন এবং ফুসসুসও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তার অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংগপ্রত্যংগগুলো কিন্তু একটি 'মিনিমাম লেভেলে' কাজ করে যাচ্ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই শক্তিটুকুই জিমির দেহে পুনরায় হৃৎস্পন্দন আর শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য ছিলো যথেষ্ট। চিকিৎসকরা একমত যে, বরফ শীতল ঠান্ডা পানি অনেকক্ষেত্রেই ক্লোরফর্মের মত অবচেতকের কাজ করে। আর তাই এ ধরণের পরিস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ কাটিয়েও বেঁচে যাবার উদাহরণ কিন্তু জিমি একা নয়। লস ভেগাসের মুরে ব্রাউন আধাঘন্টা কিংবা উতাহ শহরে মিশেল ফাঙ্ক একঘন্টা ধরে বরফ-জলে ডুবে অচেতন হয়ে থাকবার পরও চিকিৎসকরা তাদের কিন্তু বাঁচাতে পেরেছেন।

**চিত্র ১.৪:** মিশেল ফাঙ্কঃ বরফ জলে দীর্ঘক্ষণ (৬৬ মিনিট) ডুবে থেকেও বেঁচে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ব রেকর্ড ; (ক) তার আড়াই বছর বয়সের ছবি (খ) এখনকার ছবি

এবারে আসি মৃত্যুক্ষণের আলোচনায়। রোগীর মৃত্যুর 'সঠিক' সময় নির্ধারণ করাটাও অনেকক্ষেত্রে অসুবিধাজনক, কারণ দেখা গেছে বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগ দেহের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে, যেমন মস্তিষ্ক ৫ মিনিট, হৃৎপিন্ড ১৫ মিনিট, কিডনী ৩০ মিনিট, কঙ্কাল পেশী - ৬ ঘন্টা। অংগ বেঁচে থাকার অর্থ হল তার কোষগুলো বেঁচে থাকা। কোষ বেঁচে থাকে তৎক্ষণই যতক্ষণ এর মধ্যে শক্তির যোগান থাকে। শক্তি উৎপন্ন হয় কোষের অভ্যন্তরস্থ মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার কার্যকারিতা ক্ষুন্ন হলে কোষেরও মৃত্যু হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি প্রক্রিয়া। দেহের মৃত্যু দিয়ে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়, শরীরের শেষ কোষটির মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

## প্রাণের বৈশিষ্ট্য :

মৃত্যুর ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল। এবার তাহলে আবারো সেই পুরোন সমস্যায় ফিরে যাই। জীবনের বৈশিষ্ট্য তবে আমরা কাকে বলব? এটা তো নতুন করে বলে দেওয়ার দরকার নেই যে, জীবিত দেহে সত্যই প্রাণ শক্তির এক ধরণের স্ফুরণ আছে, যার মাধ্যমে জীবদেহ অর্জন করে এক ধরনের 'স্বায়ত্তশাসন' (autonomy); এটিই বোধ হয় জড়জগৎ থেকে জীবকে পৃথক করে দেয়। এই স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারটা মানুষ থেকে শুরু করে তিমি মাছ পর্যন্ত সকলের জন্যই প্রযোজ্য। এমন কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেও 'নিজের মত করে কাজ করার' এক ধরণের প্রবণতা আছে, তা যতই সীমাবদ্ধ আকারে হোক না কেন। কিন্তু মুশকিল হল, ঠিক কোন মহেন্দ্রক্ষণে জীবের কাঁধে ওই 'স্বায়ত্তশাসনের ভুত' সওয়ার হয়ে প্রাণের স্পন্দন ঘটায় তা এখনও বিজ্ঞানীরা বের করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পল ডেভিস বলেন (Davies, 2003) :

> 'This property of autonomy, or self-determination, seems to touch on the most enigmatic aspect that distinguishes living from non-living things, but it is hard to know where it comes from. What physical properties of living organisms confer autonomy upon them? Nobody knows.'

তবে সবাই যে এ ধরণের নেতিবাচক মতামতের সাথে একমত তা নয়। আসলে বহু বিজ্ঞানীই মনে করেন যে প্রাণের 'মূহূর্ত', 'মহেন্দ্রক্ষণ' এ সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার খোঁজার চেষ্টা আসলে আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত (ধর্মীয়) বিশ্বাসের ফল। ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে ঈশ্বর কিভাবে কোন এক শুভ ক্ষণে আমাদের পৃথিবী এবং পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করেছিলেন। এই ধরনের বিশ্বাস আমাদের সংস্কৃতির সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে, প্রাণের উৎস নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে গিয়েও অনেকে এ ধরণের বিশ্বাস থেকে বেরুতে পারেন না, ফলে চিন্তাধারা ঘুরপাক খেতে থাকে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থেকে উঠে আসা এক বেঁধে দেওয়া ছকে। মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্সটিটিউট ফর মলিকিউলার এন্ড সেলুলার ইভলুশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী সিডনী ফক্স (প্রয়াত) এ ধরনের আবদ্ধ চিন্তাকে অভিহিত করেছেন 'channeled thinking in science' হিসেবে। তার মতে, প্রাণের উৎস নিয়ে গবেষনায় ব্রতী অনেককেই এমন সমস্ত প্রশ্ন করতে দেখা যায় যার সাথে আসলে বিজ্ঞান নয়, ধর্মীয় কাহিনীর সাযুজ্যই থাকে বেশী। পাশ্চাত্য বিশ্বে তো বটেই, এমনকি বস্তুবাদের ধারক তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়াতেও এ ধরনের ভাবধারার কমতি ছিল না। তিনি বলেন (Fox, 1988) :

> 'Much of the thinking on the subject of how life began has been channeled, for example by mythological concepts. Even scientists, including those living in an officially atheistic state, such as Oparin's Soviet Union, appear to be influenced by thinking of the past.'

প্রাণের উদ্ভব সম্বন্ধে সঠিক প্রশ্নটি করতে হলে 'চ্যানেল্ড থিঙ্কিং' থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণের উদ্ভবের পেছনে রাসায়নিক বিবর্তন প্রক্রিয়াটি ভাল মত বোঝা দরকার। জানা দরকার জীবনের রসায়নের চরিত্রটি। এ নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর কি ভাবে ধাপে ধাপে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অজৈব পদার্থ থেকেই রাসায়নিক বিবর্তনের ক্রমধারায় এক সময় জীবনের উন্মেষ ঘটতে পারে তা আলোচিত হয়ছে তৃতীয়, চতুথ ও পঞ্চম অধ্যায়ে। বিবর্তনের এই ধারাবাহিকতাটি স্পষ্ট হলেই বোঝা যাবে যে প্রাণের উন্মষ, কিংবা 'স্বায়ত্তশাসন'- যাই বলা হোক না কেন, এগুলো কোনটিই আসলে বিচ্ছিন্ন ঘটনা

নয়। কিন্তু সরাসরি সেখানে যাওয়ার আগে প্রাণের দাবীদার অন্যান্য 'বৈশিষ্ট্য'গুলোতে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক :

*প্রজনন (পুনরুৎপাদন):* জীবিত সত্ত্বার প্রজনন অথবা পুনরুৎপাদন করার ক্ষমতা থাকবে- এটাই সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু শুধু এ বৈশিষ্ট্য দিয়ে কি জীবকে সত্যই চেনা যায়? যায় না। কারণ অনেক জড় পদার্থেরই (যেমন crystal, bush fire) এক অর্থে পুনরুৎপাদন করার ক্ষমতা রয়েছে। অথচ, ভাইরাস (যাকে অনেকেই 'সজীব' হিসবে বিবেচনা করেন) কিন্তু পুনরুৎপাদন করে বিস্তৃত হতে পারে না। খচ্চর নামের প্রাণীটিকে কেউই জড় পদার্থ হিসেবে গন্য করবে না। নিঃসন্দেহে এটি সজীব, অথচ, খচ্চরের যে প্রজনন ক্ষমতা নেই তা কিন্তু আমরা জানি। একটি সফল প্রজননের ক্ষেত্রে সন্তান পিতামাতার বৈশিষ্ট্যই শুধু পায় না, সেই সাথে অর্জন করে পুনরুৎপাদন করার উপকরণ এবং পুরো প্রক্রিয়াটিও। পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াতেই জীবের প্রতিরূপায়ন (replication) ঘটে; আর বংশগতির বাহক জিন পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। শুধু তাই নয়, জিনগুলোর মধ্যেও প্রতিরূপায়ন ঘটে।

*বিপাক ক্রিয়া:* কেউ নিজেকে 'সজীব' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে তার কিন্তু অনবরত কাজ করে যেতে হয়। প্রতিটি জীবদেহই জটিল কিছু বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের রূপান্তর ঘটায় আর এর মাধ্যমে চলাফেরা, প্রজননসহ বিভিন্ন কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ব্যয় করে থাকে। রাসায়নিক পদার্থের রূপান্তর বা প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে শক্তির এই ব্যয়কে বিপাক ক্রিয়া (metabolism) নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু স্রেফ 'মেটাবলিজম' মানেই জীবন নয়। কিছু অনুজীব আছে যারা দেহের অতি জরুরী কিছু কার্যপ্রণালীকে সাময়িক সময়ের জন্য একেবারে বন্ধ করে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাদের তো আমরা 'মৃত' বলতে পারি না। কারণ প্রয়োজন পড়লে তারা আবার বিপাক ক্রিয়া ফিরিয়ে এনে 'জীবিত' হয়ে উঠতে পারে।

*পুষ্টির যোগান:* এটা অনেকটা বিপাক ক্রিয়ার সাথেই সম্পর্কিত। না খেতে পারলে কোন জীবদেহই বেঁচে থাকতে পারে না। খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে জীবদেহ শক্তি সঞ্চয় করে যা পরে তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে ব্যয় করে। মানুষের মত প্রাণীরা খাওয়ার জন্য সাহায্য নেয় হাত মুখ নখ, দাঁত

পাকস্থলীর, উদ্ভিদেরা নেয় সালোক-সংশ্লেষণ নামের একটি প্রক্রিয়ার। এর ফলে পদার্থ এবং শক্তির এক নিয়ত প্রবাহ ঘটে। কিন্তু স্রেফ পদার্থ এবং শক্তির প্রবাহ দিয়েই জীবনকে কোন ভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বৃহস্পতি গ্রহের বুকে যে লাল দাগগুলো দেখা যায় তা কিন্তু পদার্থ এবং শক্তির নিয়ত প্রবাহের মাধ্যমে ঘটা এক ধরণের প্রবাহ-ঘূর্ণি (fluid-vortex) ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু কেউ বলবে না যে ওগুলো জীবিত। উপরন্তু, জীবনের জন্য শক্তি প্রয়োজন - এ ব্যাপারটাও বোধ হয় ঢালাওভাবে সত্যি নয়; যেটি প্রয়োজন তা হল 'ব্যবহার উপযোগী' বা 'মুক্ত' শক্তি। এ নিয়ে পরে আরো আলোচনা করা হবে।

*জটিলতা:* জীবন জিনিসটা যে ভয়ানক রকমের জটিল এ নিয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এমনকি সামান্য যে ব্যাকটেরিয়া - এর মত এক কোষী জীবের গঠন আর কর্মকান্ডেও জটিলতার কোন কমতি নেই। বস্তুতঃ এই জটিলতাই জীবদেহকে করে তুলেছে জড় জগৎ থেকে আলাদা আর জীবন প্রবাহকে করে তুলেছে 'অনিশ্চিত'। কিন্তু তারপরেও স্রেফ জটিলতা দিয়ে কি জীবনকে ব্যাখ্যা করা যাবে? কক্সবাজারের উপকূলে ধেয়ে আসা হারিকেনের প্রকৃতিও তো জটিল, তার চেয়েও জটিল আমাদের গ্যালাক্সি 'আকাশ গঙ্গা'। এগুলো কোনটিই জীবিত নয়। পদার্থবিদেরা প্রায়শঃই কোয়ান্টাম জগতের জটিলতাকে বিশৃঙ্খল (chaotic) হিসেবে চিহ্নিত করেন; কোয়ান্টম ফ্লাকচুয়েশন, আনবিক পরিবৃত্তি কিংবা নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের মত ঘটনাগুলো এতই 'জটিল' যে এগুলোকে কোন নিয়ম বা কার্য-কারণের মধ্যে ফেলে আগাম কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। তারপরেও তো সেগুলো জীবিত নয়।

*সংগঠন:* হয়ত আলাদা ভাবে জটিলতার কোন অর্থ নেই, যতক্ষণ না এটি 'সাংগঠনিক জটিলতা'য় রূপ নেয়। জীবদেহের অংগ-প্রত্যংগ-উপাংগগুলো একসাথে সমন্বিত ভাবে কাজ না করতে পারলে জীবনের কোন অর্থ হয় না। আমাদের শরীরের ভিতরে থাকা রক্তবাহী শিরা আর ধমনীগুলো যতই প্যাঁচানো আর জটিল হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত হয়ে রক্তসঞ্চালণে অংশ নেয়, আলাদা কোন ভূমিকা দাবী করতে তো পারে না। আমাদের দু'পায়ের আলাদা ভাবে চলাফেরা করার ক্ষমতারও কোন গুরুত্ব থাকবে না যদি না সেগুলো একে অপরের সাথে সমন্বিত হয়ে হাঁটা চলায় সুবিধা দিতে পারে। সমন্বিত করার পুরো ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রণে আমাদের 'জটিল' মস্তিস্কের ভূমিকা তো আছেই।

এমনকি সাধারণ একেকটি কোষেও এই ধরণের সমন্বয় ও সহায়তার যে নমুনা পাওয়া যায় তা রীতিমত বিস্ময়কর। কিন্তু তারপরও এই সমন্বয়ই কিন্তু জীবন নয়। কারণ সমন্বয়ের ব্যাপারগুলো জড়জগতেও বিরল নয়। বহু ক্ষুদ্র অণুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থেকে নিজস্ব ধর্মানুযায়ী সংগঠিত হয়, এমনকি তৈরী করে জটিল নক্সার কাঠামো পর্যন্ত। প্রকৃতিতে এ ধরণের স্ব-সংগঠন (self-organization)-এর বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে।

*বৃদ্ধি ও বিস্তার:* প্রতিটি জীবেরই বৃদ্ধি ঘটে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলে বিস্তৃত হয়। কিন্তু তেমন বৃদ্ধি এবং বিস্তার তো জড় পদার্থের মধ্যেও দেখা যায়। লোহার টুকরা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় ফেলে রাখলে তাতে মরিচা ধরে আর সময়ের সাথে সাথে সেই মরিচার বৃদ্ধি বিস্তার সবই ঘটে। লবনের দানায় কেলাস তৈরী কিংবা সন্ধ্যার আকাশে মেঘের বিস্তার - এগুলো তো আমাদের চোখের সামনেই দেখা। তবে তারপরেও বলতেই হবে যে, জীবজগতে বৃদ্ধি ও বিস্তারের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এ পৃথিবীতে প্রাণের যে নান্দনিক বিকাশ ও বিস্তার তা ঘটেছে বিবর্তনের ক্রমধারায়। অবশ্যই জীবজগতের ভিতর প্রকারণ (variation) থাকাটা এর পিছনে মূল চাবিকাঠি। এই প্রকারণ বজায় রেখে প্রতিরূপায়ন (replication) ঘটিয়ে জীবজগতে ডারউইনীয় পদ্ধতিতে বিবর্তন ঘটে চলেছে অনবরত। জীবের বৃদ্ধি আর বিকাশকে এই প্রেক্ষাপটে ফেলেই আমাদের বিচার করতে হবে। শুধু বৃদ্ধি কিংবা বিস্তার কেন জীবনের সংজ্ঞাই হয়ত এই কাঠামোর মধ্যে ফেলে ঢেলে সাজানো সম্ভব - 'যদি ডারউইনের দেখানো পথে কোন কিছুর বিবর্তন ঘটে, তাকে আমরা সেটিকে জীবিত হিসেবে গণ্য করতে পারি'।

*তথ্যের সমাহার :* সাম্প্রতিক কালে অনেক বিজ্ঞানী কম্পিউটারের সাথে জীবনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার কথা বলছেন। তাঁরা বলেন, জীবের প্রতিরূপায়ন ঘটানোর জন্য 'প্রয়োজনীয় তথ্য' জিনের মাধ্যমে বাবা মা থেকে সন্তান সন্ততিতে স্থানান্তরিত হয়। সে হিসেবে জীবনকে তথ্যের সমাহার দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তারপরও, শুধু তথ্য থাকাটাই সব নয়। জঙ্গলে গাছ থেকে অনবরত পাতা ঝরে পড়ার মধ্যেও তো অনেক 'তথ্য' লুকানো আছে। তথ্য আছে বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধূলিকনার মধ্যেও। কিন্তু আমাদের কাছে সে সমস্ত তথ্যের কোন মানে নেই। জীবনের গতিশীলতা সঠিক ভাবে সংগায়িত হতে হলে তথ্যকে হতে হবে 'অর্থবহ'। আর অর্থবহ হতে হলে আলোচিত সিস্টেমের সাপেক্ষে এর একটি প্রাসঙ্গিকতা (context) থাকতে হবে। অর্থাৎ, মোদ্দাকথা হল, তথ্যকে একটি পরিকাঠামোর মধ্যে বিশেষিত

(specified) হতে হবে। কিন্তু সেই কাঠামোগত প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপারটি আসবে কোত্থেকে? আর কিভাবেই বা সেই অর্থবহ ভাবে বিশেষিত হওয়ার ব্যাপারটা প্রাকৃতিকভাবে স্বতঃস্ফুর্তভাবে উদ্ভুত হবে?

*হার্ডওয়্যার এবং সফট্ওয়্যার :* জীবনের ভিত্তিমূল হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে মূলতঃ দুটি উপাদানকে : নিউক্লিয়িক এসিড (আরএনএ/ডিএনএ) এবং প্রোটিন। এ দুটি উপাদানই রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে অপরের পরিপূরক। শুধু তাই নয় জীবন গঠনে এদের ভুমিকাও খুবই ব্যাপক। নিউক্লিয়িক এসিডগুলো যেন আক্ষরিক অর্থেই কাজ করে জীবনের 'সফট্ওয়্যার' হিসেবে। আর অন্যদিকে প্রোটিনগুলো যেন কর্মীবাহিনী যারা গড়ে তুলে শক্ত-পোক্ত হার্ডওয়ারের কাঠামো। এ দুই রাসায়নিক জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এক ধরণের কোডের মাধ্যমে, যাদের আমরা 'জেনেটিক কোড' হিসেবে আভিহিত করি। বিজ্ঞানীরা বলেন, এদুই-ই আসলে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা খুব 'অগ্রসর পণ্য'; হার্ডওয়্যার এবং সফট্ওয়্যারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জটিল জীবনের নিয়ামক।

*স্থায়িত্ব এবং পরিবর্তনশীলতা:* জীবনের গোলকধাঁধার আরেক রহস্য হচ্ছে এটি 'স্থায়িত্ব' ও 'পরিবর্তনশীলতা'র এর অভূতপূর্ব সমন্বয়। এ যেন এক পুরোন দার্শনিক সমস্যা-'থাকা' বনাম'হওয়া' (being versus becomming)-এর মিলন ক্ষেত্র। আমরা জানি জিনের কাজ হচ্ছে প্রতিরূপায়ন ঘটানো, জেনেটিক তথ্যকে সংরক্ষণ করা। কিন্তু প্রকারণ ছাড়া তো জীবের অভিযোজন ঘটতে পারে না, আর অভিযোজিত না হলে জিনও টিকে থাকতে পারে না। কোন কিছু টিকে থাকতে না পারলে ডারউইনীয় পদ্ধতিতেই ঘটে এর বিনাশ। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে কিভাবে তাহলে 'সংরক্ষণ' এবং 'পরিবর্তনশীলতা'র মত দুটি 'পরস্পর বিরোধী' জিনিস একই ব্যবস্থার মধ্যে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে? নিঃসন্দেহে ব্যাপারটি বিস্ময়কর। এ ধরনের নানা বিস্ময়কর ব্যাপার-স্যাপার নিয়েই কিন্তু গড়ে উঠেছে 'রহস্যময়' প্রাণ।

জীবন নিয়ে এত জ্ঞান-গম্ভীর আলোচনার পরও জীবনের সংজ্ঞা আমাদের কাছে স্পষ্ট হল কি? দেখাই যাচ্ছে জড় থেকে জীবকে পৃথক করার পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলো অনেক ক্ষেত্রেই খুব পরিস্কার নয়। কাজেই প্রাণের এই দুর্গম রহস্য ভেদ করা চাট্টিখানি কথা নয়! সমস্যাটি আরো ভালভাবে বোঝা যাবে যতই আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হব আর পরবর্তী

অধ্যায়গুলোতে ভাইরাস, ভিরইডস এবং প্রিয়ন সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানতে পারব। সত্যি বলতে কি, জড় থেকে জীবকে একটি শক্ত সীমারেখা দিয়ে পৃথক করার চেষ্টাই হচ্ছে প্রকারন্তরে মেনে নেওয়া যে 'প্রাণ' জিনিসটা প্রাকৃতিক কিছু নয় বরং যাদুকরী, অপার্থিব কিংবা অলৌকিক কিছু। কাজেই এ ধরনের পৃথকীকরণ প্রচেষ্টাও হয়ত এক ধরনের দীর্ঘদিনের 'চ্যানেল্ড থিংকিং' ছাড়া কিছু নয়। প্রাণ জিনিসটা কিন্তু এমন নয় যে, ওপর থেকে কিছু খোসা ছাড়িয়ে নিলেই ভিতর থেকে 'সজীব' কোন অণু বেড়িয়ে পড়বে - যেটি জীবনের ভিত্তিমূল। ওভাবে মাটি খুঁড়ে 'জীবন' পাওয়া যাবে না; কারণ এ ধরনের কোন 'সজীব অণু'র কোন অস্তিত্বই আসলে নেই। বরং প্রাণ নামক সজীব অভিব্যক্তিটি গড়ে উঠেছে অসংখ্য নিষ্প্রাণ অণুদের বিভিন্ন সমন্বিত প্রক্রিয়া থেকেই। কিন্তু কি ভাবে?

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৩;
পুনর্লিখন : ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০০৬

---

{প্রথম অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...